তেজগাঁও-এ একের পর এক খুন

নেপথ্যে মাদক ব্যবসা ও দৈনিক ৫ লাখ চাঁদাবাজি

সুইডেন আসলাম, পিচ্চি হান্নান, কিলার আব্বাস, আলাউদ্দিন ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের কিংবদন্তি। মৃত বা জীবিত অবস্থায় কিংবা জেলে থেকে এখনও পার্টি প্রধান। প্রত্যেকেই একাধিক হত্যাসহ অসংখ্য মামলার আসামি। র‍্যাবের ক্রসফায়ারে পিচ্চি হান্নান, পুলিশের হাতে কিলার আব্বাস ও গণপিটুনিতে আলাউদ্দিন মারা গেলেও তাদের নামে বাহিনী আছে এবং চাঁদাবাজি, বোমাবাজি, হত্যা, ধর্ষণ এখনও এইসব বাহিনীর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এসব সন্ত্রাসীদের কর্মকান্ড এত বীভৎস ছিল সাধারণ মানুষ এখনও তাদের মৃত্যুর বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারছে না। মূর্তিমান আতঙ্ক পিচ্চি হান্নান, কিলার আব্বাস, আলাউদ্দিন খুন হবার পরেও তেজগাঁওবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না।

রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে সন্ত্রাস কবলিত এলাকা তেজগাঁও। এই এলাকার বিশাল অংশ জুড়ে শিল্প এলাকা, একটি অংশ বস্তি, অপর অংশ রেলওয়ে কলোনি। এছাড়া দেশের প্রধান কাঁচাবাজারখ্যাত কারওয়ান বাজার এখানে অবস্থিত। মূলত তিনটি কারণে এখানে সন্ত্রাসী বা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জন্ম। একদিকে বিপুল অঙ্কের টাকার হাতছানি, সহজে আত্মগোপন যোগ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো।

তেজগাঁও রমনার যারা শীর্ষ সন্ত্রাসী ছিল এবং বর্তমানেও আছে তাদের সবাই প্রথম জীবনে ছিল মাছ বিক্রেতা, মুরগি বিক্রেতা, ফল বিক্রেতা, সবজি বিক্রেতা নতুবা বস্তির ছেলে। চাঁদাবাজকে চাঁদা দিতে গিয়ে নয়, সন্ত্রাসীকে মোকাবেলা করতে গিয়ে নিজেই একসময় এরা শীর্ষ সন্ত্রাসী হয়ে গেছে।

শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর সন্ত্রাসীরা জায়গা দখল করে নেয়। যার ফলে পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না।

তেজগাঁও সন্ত্রাসী তৎপরতার মূল কারণ তেজগাঁও রেল স্টেশনকে ঘিরে বিশাল মাদক ব্যবসা এবং কারওয়ান বাজারের কাঁচা টাকার হাতছানি। মূলত কারওয়ান বাজারে চাঁদাবাজি এবং রেল স্টেশনের মাদক ব্যবসা ঘিরে সন্ত্রাসীদের আনাগোনা ও তৎপরতা বেশি হয়। এক সময় শুরু হয় নিয়ন্ত্রণ ও দখলের প্রতিযোগিতা। অকালে ঝরে পড়ে অনেকেই।

তেজগাঁওকে ঘিরে মাদক ব্যবসা ও চাঁদাবাজি সৃষ্টি হয় আশির দশক থেকে। তখন এ সকল কাজে সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে তৎকালীন জাতীয় পার্টির কমিশনার বর্তমানে ট্রাক ড্রাইভার্স ইউনিয়ন নেতা মাহমুদুল আলম (মন্টু)-এর বিরুদ্ধে। আশির দশক থেকেই শুরু হয় সশস্ত্র তৎপরতা, দখল পাল্টা দখলের রাজনীতি। এরশাদ শাসনামলে ৯ বছর তেজগাঁও ছিল ফেনসিডিল, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, গাঁজা, বাংলা মদের অন্যতম উৎস। ঐ সময় এখান থেকে সারা ঢাকা শহরে ফেনসিডিল যোগান দেয়া হত।

নব্বইয়ের দশকের দিকে বিস্ময়কর উত্থান ঘটে সুইডেন আসলামের। ঢাকা শহরের অধিকাংশ এলাকা তার দখলে চলে যায়। প্রত্যেক মহল্লার অলিগলিতে সুইডেন আসলামের নামে চাঁদাবাজি এবং ফেনসিডিল ব্যবসা জমজমাট রূপ ধারণ করে। সুইডেন আসলাম এ সময় ঢাকা শহর জুড়ে বিশাল বাহিনী গড়ে তোলে। সুইডেন আসলাম বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় গ্রেপ্তার হয়ে জেলখানায় রয়েছে। তার অবর্তমানে তার বাহিনী পরিচালনা করছে ছোট ভাই জাকির হোসেন। সন্ত্রাসী জাকির ফার্মগেট, রাজাবাজার, কাজীপাড়া, মনিপুরী পাড়া, ইন্দিরা রোড, খামার বাড়ি, সংসদ এলাকায় চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসা পরিচালনা করে। তার সঙ্গে তেজগাঁও বিএনপির নেতাদের দহরম মহরম। মূলত সরকারি দলের আশীর্বাদ এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় সে জমজমাটভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

তেজগাঁওয়ের শাহীনবাগ এবং পূর্ব নাখালপাড়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল রায়পুরা সেলিমের। এক সময় রায়পুরা সেলিম ওরফে সেইল্যা রংবাজ কারওয়ান বাজারে হোটেলে মরা মুরগি সাপ্লাই দিত। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে শীর্ষ সন্ত্রাসী আতা বাহিনী প্রধান আতাউল হক আতার সঙ্গে যৌথভাবে বিশাল বাহিনী গড়ে তোলে। শাহীনবাগ, পূর্ব নাখালপাড়া, পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজকুনীপাড়া কলোনিকে ঘিরে অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা চালিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করে। সরকার পতন হলে প্রশাসন ও বিএনপি সন্ত্রাসীদের যৌথ আক্রমণের মাথায় টানা এক সপ্তাহ বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ সময় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সন্ত্রাসী আতার সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয়। আতা বাহিনী খুন করে শীর্ষ সন্ত্রাসী গোলাম মোস্তফা মাসুদ ওরফে ল্যাংড়া মাসুদকে।

রায়পুরা সেলিম একটি অপারেশনে ট্যাক্সি ক্যাবে আসার সময় উত্তরায় পুলিশ ব্যারিকেড

সর্বশেষ শিকার খোরশেদ আলম বাচ্চু

খোরশেদ আলম বাচ্চু

তেজগাঁওয়ে সর্বশেষ হত্যার শিকার ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক খোরশেদ আলম বাচ্চু। গত ১৭ মে নিজ বাড়ির অদূরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে তিনি নিহত হন। বাচ্চু যে এলাকায় খুন হন তা তেজকুনিপাড়ার কসাইবাড়ি এলাকার সন্ত্রাসী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ এলাকায় একচ্ছত্র আধিপত্য শীর্ষ সন্ত্রাসী রায়পুরা সেলিম ওরফে সেইল্যার। সেইল্যার গ্রুপের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখে পূর্ব নাখালপাড়ার চিহ্নিত সন্ত্রাসী রিপন, মরা লিটন, কুত্তা লিটন, শীর্ষ সন্ত্রাসী মুন্না প্রমুখ। এলাকার বর্তমান অবস্থায় সেইল্যার বাহিনীর বাইরে অন্য জায়গা থেকে লোক এসে কাউকে হত্যা করা সম্ভব নয়।

অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম বাচ্চু হত্যার মধ্য দিয়ে এলাকাছাড়া হয়েছে তেজগাঁও থানার তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী পিচ্চি কামাল। কসাইবাড়ী এলাকার মাদক সাম্রাজ্যের কথা সর্বজনবিদিত। মাদকবাহিনী প্রধান পিচ্চি কামালের সঙ্গে খোরশেদ আলমের কথা কাটাকাটি হয়। পুলিশ মনে করছে, দলীয় কোন্দলের সুযোগ নিয়ে এ সন্ত্রাসী গ্রুপটি হত্যাকান্ড ঘটাতে পারে। কাফরুলের ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি গঠন করার পরপর বাচ্চুকে অজ্ঞাত স্থান থেকে টেলিফোনে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছিল। গত ১৭ মে সন্ত্রাসীরা তার প্রাণ কেড়ে নিয়ে হুমকির যথার্থতা প্রমাণ করে।

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্ব কাজে লাগিয়ে পেশাদার কিলার গ্রুপ এবং স্থানীয় সন্ত্রাসী গ্রুপের সমন্বয়ে এই হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছে বলে স্থানীয় লোকজন মনে করছে। পাশাপাশি মহানগরের প্রভাবশালী নেতারা জড়িত থাকতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। মাদক ব্যবসা এবং চাঁদাবাজি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে এলাকায় এখন আর কারো জীবনের নিরাপত্তা নেই। যে কারো সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পারিবারিক দ্বন্দ্ব কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষ বা সুবিধাবাদীরা সহজেই হত্যাকান্ড ঘটাতে পারে। বাচ্চু হত্যাকান্ড তেজগাঁওয়ের সন্ত্রাসীদের ভয়ানক তৎপরতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

দিলে পুলিশকে গুলি করে হত্যা করে এবং গ্রেপ্তার হয়। তার অবর্তমানে তার বাহিনী পরিচালনা করতে গিয়ে শাশুড়ি, স্ত্রী পুলিশের হাতে সশস্ত্র অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়। এই সময় সন্ত্রাসী গিয়াসউদ্দিন ঘেসু মারা যায়। শাহীনবাগ সন্ত্রাসী মুন্না, পূর্ব নাখালপাড়া সন্ত্রাসী ল্যাংড়া ওরফে কুত্তা লিটন, পশ্চিম নাখালপাড়া লেংড়া কাজল, মোটা বাবু ও সিরাজ দখলে রেখেছে। এখানকার রেল কলোনি এবং বস্তিতে নিয়মিত বিক্রি হচ্ছে ফেনসিডিল, হেরোইন, প্যাথেডিন।

সন্ত্রাসের স্বর্গভূমি তেজকুনী পাড়ার একটি অংশ দখলে রেখেছে সন্ত্রাসী আতা। ইতিমধ্যে তার বাহিনীর তুহিন, রিংকু পুলিশের হাতে মারা গেছে। কিছুদিন আগে আতার প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসী দেলোয়ার হোসেন দেলু জেল থেকে মুক্তি পেলে পুলিশ ক্রসফায়ারে হত্যা করে। পাইন্যা সর্দারের বস্তির ভিটেশাল বস্তিতে বিক্রি হয় মাদক দ্রব্য যা নিয়ন্ত্রণ করে আতা বাহিনী।

তেজকুনী পাড়ার কসাই পাড়ায় সন্ত্রাসী পিচ্চি কামাল, ল্যাংড়া বাবুর আধিপত্য রয়েছে। মাদক চোরাচালানির স্বর্গভূমি হিসাবে চিহ্নিত। কলোনি এলাকা ঘিরে রেখেছে ছাত্রদল যুবদলের নেতারা। শেখ রাসেল ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় ছাত্রদল নেতা আওলাদের আধিপত্য রয়েছে। তেজগাঁওয়ের সবচেয়ে বড় হেরোইন স্পট হিসেবে চিহ্নিত। এখানে পুলিশ সারাদিন টহল দিলেও তাদের সামনেই ফেনসিডিল, হেরোইন বিক্রি হয়।

তেজগাঁও ট্রাক স্টান্ডকে ঘিরে যে ব্যবসা চলছে তার সঙ্গে ট্রাক ড্রাইভার্স ইউনিয়নের নেতারা জড়িত। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল আলম (মন্টু) নিজে একাধিকবার সশস্ত্র মহড়ার নেতৃত্ব দিয়েছেন। কারওয়ান বাজারের চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছে। এছাড়া বেগুনবাড়ি ঝিল এবং তেজগাঁও শিল্প এলাকায় তার নামে চাঁদাবাজি হয়। তেজগাঁও ভিত্তিক চাঁদাবাজির অন্যতম হোতা হিসেবে চিহ্নিত।

কারওয়ান বাজারের চাঁদাবাজির মূল গডফাদার যুবদল নেতা নবী সোলায়মান এবং বিএনপি নেতা এল রহমান। তারা তেজগাঁওয়ের সকল মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি, রাহাজানি, চুরি ডাকাতির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। তেজগাঁওভিত্তিক সকল শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সকল ধরনের সহযোগিতা করে থাকে। তাদের এ কাজে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করে ওহিদ মোল্লা ও সুরুজ মিয়া।

নবী সোলায়মান এবং এল রহমান প্রথম জীবনে একজন রিকশা গ্যারেজের পাহারাদার এবং অপর জন বিদেশ গমনে প্রত্যাখ্যাত ছিলেন। নবী সোলায়মান হত্যা মামলার আসামি। শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান, নিটেল শাহাবুদ্দিন, দেলোয়ার, কিলার আব্বাস সুইডেন আসলামের গডফাদার হিসাবে চিহ্নিত।

অপরদিকে এল রহমান সন্ত্রাসী জাকির হোসেন, মুন্না, আতা, সেইল্যা, পিচ্চি কামাল, ল্যাংড়া বাবু, ল্যাংড়া কাজলের গডফাদার হিসেবে চিহ্নিত।

ইতিমধ্যে উভয় গডফাদার চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেলহাজতে রয়েছে। তাদের অবর্তমানে বাহিনী পরিচালনা করছেন শীর্ষ সন্ত্রাসী আশিক, তার সঙ্গে রয়েছে দুলাল, মন্টু, কুদ্দুস, শাহ আলম, পলাশ, মনা, সাঈদ, আমিন মেম্বার, ইয়াকুব, খোরশেদ, হারুন চৌধুরী, কাঞ্চন মিয়া ও আমিনুল। কাঞ্চন ও হারুন ব্যাংক ডাকাতির মামলায় ২৬ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি। খোরশেদ চাঁদাবাজি করে মার্কেটের আড়ৎদার হয়েছে। সে বাজারের রাস্তার দু'পাশে গড়ে ওঠা চাঁদা তোলার কাজটি নিয়ন্ত্রণ করে।

সুইডেন আসলাম ও নবী সোলয়ামান যুবলীগ নেতা গালীব হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী এবং অন্যতম আসামি। এদের বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজি, ও দ্রুত বিচার আইনে মামলা রয়েছে।

আলাউদ্দিন মারা যাবার পর থেকে বেগুনবাড়ি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে ল্যাংড়া বাদল। তার সঙ্গে রয়েছে বশির, মানিক, কাউসার ন্যাটা বাবু, ঘোড়া সেলিম প্রমুখ।

কাঁঠালবাগানের বিশাল নাসিরুল্লাহ বস্তি, বুড়ির বস্তি, লালপুকুরের মাজার এলাকায় মদ, গাঁজা, আফিম, তাড়ি, হেরোইনসহ নেশাজাতীয় দ্রব্যের মেলা বসে। কারওয়ান বাজারভিত্তিক চাঁদাবাজরাই এ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। কারওয়ান বাজারের শীর্ষ সন্ত্রাসী আশিকের পক্ষে মুকুল, তারেক বস্তিতে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনা করে। আমতলা বস্তি পরিচালনা করে শীর্ষ সন্ত্রাসী জাকির।

তেজগাঁওভিত্তিক মাদক ব্যবসায়ীরাই এখনও নিয়ন্ত্রণ করে আগারগাঁও বিএনপি বস্তি। এ বস্তিতে এখন ভ্রাম্যমাণ ফেনসিডিল মেলা বসে। প্রভাবশালী বিএনপি নেতার নির্দেশে মাদক ব্যবসা চললেও স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার ভয়ে কোনো কথা বলেন না।

মাদকদ্রব্য চোরাচালানের ট্রানজিট রুট তেজগাঁও রেলস্টেশনে বেশির ভাগ মাদক আসে রেলগাড়িতে। অভিযোগ রয়েছে, বেশির ভাগ মাদক আসে ভারত থেকে। তবে হেরোইন আসে পাকিস্তান থেকে। পাকিস্তানের নির্মিত হেরোইন প্যাকেটের গায়ে বাঘের ছবি এবং দুটি ক্রস পতাকা থাকে। যার কোড নম্বর-১৮৫। বলা হয় ডাবল টাইগার হোয়াইট কালার।

তেজগাঁও রেলস্টেশনের মাদকের অন্যতম যোগান আসে সড়কপথে কাঁচপুর-সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে। ভারত থেকে সিলেট, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া, ভৈরব, ফেনী ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার ফেনসিডিল, হেরোইন, বিভিন্ন ধরনের মদ, গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য রাতের আঁধারে পৌঁছে যায় তেজগাঁও রেলস্টেশনে। মাদকদ্রব্য পাচার ও বিক্রয়ের সঙ্গে তেজগাঁও থানার অসংখ্য সন্ত্রাসী, রাজনৈতিক ক্যাডার ও পুলিশ জড়িত। অধিকাংশ সন্ত্রাসী তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে পুলিশের ছত্রছায়ায়।

তেজগাঁও থানায় যে লোমহর্ষক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় তার অধিকাংশ কারণ এই মাদক ব্যবসা। শীর্ষ সন্ত্রাসীর জন্ম এবং পতন হওয়ার পেছনে মাদক ব্যবসা এবং কারওয়ান বাজারের চাঁদাবাজির কাঁচা টাকার হাতছানি রয়েছে। চাঁদাবাজি ও মাদক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণেই এখানে হত্যা, খুন, ধর্ষণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

শুধু কারওয়ান বাজারে প্রতিদিন কাঁচাবাজার ও সংলগ্ন এলাকায় চাঁদা আদায় হয় সাড়ে তিন লাখ টাকা। এই টাকা ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বচসার কারণে লাশ পড়ে প্রায়শই।

তেমনি রেলস্টেশন এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন মাদকদ্রব্য বিক্রি হয় প্রায় ২ লাখ টাকার। এ টাকার ভাগবাটোয়ারা এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ, পড়ে লাশ। চাঁদাবাজি, মাদকদ্রব্য এবং চোরাচালানির টাকার নিয়মিত ভাগ পায় প্রশাসন, সরকারদলীয় নেতা এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিশনার। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে পরের দিন তার লাশ পড়ে থাকে রাস্তায়। যে কারণে স্থানীয়রা তো দূরের কথা, ওয়ার্ড কমিশনারও তেমন কোনো ভূমিকা নিতে পারছেন না।

কাঁচা টাকা উপার্জনের এ প্রতিযোগিতায় যেভাবে লাশ পড়ছে তা থেকে তেজগাঁওবাসী কবে মুক্তি পাবে তা নিজেরাও জানে না। মাদকদ্রব্যের অবাধ চালান বন্ধ এবং কারওয়ান বাজারে বেপরোয়া চাঁদাবাজি বন্ধ করতে পারলেই কেবল এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

তেজগাঁও রেল স্টেশন এবং কারওয়ান বাজার থেকে মাদক ব্যবসা ও চাঁদা হিসেবে প্রতিদিন সন্ত্রাসী গ্রুপ আয় করে ৫ লাখ টাকা। মূলত বিরাট অঙ্কের এই চাঁদাবাজির টাকা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে তেজগাঁওয়ের আন্ডার ওয়ার্ল্ড সব সময় উত্তপ্ত থাকে। যে কোনো ইস্যুতেই পড়ে যায় লাশ। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে চাঁদাবাজ ও মাদক ব্যবসার প্রতিবাদকারী অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম বাচ্চুকে হত্যা করা হয় গত ১৭ মে। তার হত্যার পেছনে প্রতিদিন ৫ লাখ টাকার অবৈধ আয়ের চাঁদাবাজী ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড জড়িত বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করে।

আলোচিত ১৭ হত্যাকান্ড

২০০১ সালে সরকার পতনের পর মাদক ব্যবসা এবং চাঁদাবাজির আধিপত্য বিস্তার নিয়ে যারা খুন হয়েছে তার মধ্যে কাজী পারভেজ লাবু, গিয়াস উদ্দিন ঘেসু, কিলার আব্বাস, আলাউদ্দিন, গোলাম মোস্তফা ওরফে ল্যাংড়া মাসুদ, মুক্তার হোসেন, রাজু, বরুন, নিটেল শাহাবুদ্দিন রনি প্রমুখ। সন্ত্রাসীদের সর্বশেষ শিকার আওয়ামী লীগ নেতা খোরশেদ আলম বাচ্চু। পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধ এবং ক্রসফায়ারে পিচ্চি হান্নান, টিক্কা, মোল্লা মাসুদ, তুহিন, দেলোয়ার হোসেন ওরফে দেলু প্রমুখ শীর্ষ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুইডেন আসলাম গুলি করে হত্যা করে যুবলীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি মির্জা গালিবকে।